আপনার সেবায় আপনার আমানত

মাওলানা মোহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
www.jubaer ahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৭৯৮ ৪১৮ ১০০

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯ ইং.

আপনার সেবায় আপনার আমানত
মাওলানা মোহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী
প্রকাশক : আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
স্বত্ব : পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে।
কম্পোজ : মাওলানা আলী হাসান

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
বাংলাবাজার ও বায়তুল মোকাররমসহ দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীসমূহ
এছাড়া fb.com/twominuteshop অথবা www.2minuteshop.com –এ অডার করলে সারা দেশে খুচরা ও পাইকারি মূল্যে বই পাঠানো হয়।

হাদিয়া : ত্রিশ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগে মহিমান্বিত মহামণীষীদের প্রতি।

হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) মানবদরদী একজন মানুষ। মানবতার কল্যাণে তিনি থাকেন সর্বদা অস্থির। মানুষকে তার চিরস্থায়ী বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি থাকেন সর্বদা বেকুল। তিনি ভালবাসতে জানেন মানুষকে। চাই মানুষটি যে কোন ধর্মের হোক না কেন। তিনি মানুষের কাছে ভালোবাসার পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরদ মাখা ভাষায় একটি বই রচনা করেছেন। বইটি লিখেছেন হিন্দি ভাষায়। বইটির নাম 'আপনার সেবায় আপনার আমানত'। বইটি পড়ে হাজারো মানুষ তার সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছন। দিশা পেয়েছন সঠিক পথের।

আমি ইচ্ছে করলাম এই বইটির সাথে একটা সম্পর্ক রেখে আমি যেন সওয়াব অর্জন করতে পারি। খুশি করতে পারি আমার প্রভুকে। সে আশায় বইটির অনুবাদ শুরু করি। ইতিপূর্বেও আরো কয়েকটি অনুবাদ হয়েছে। আমি তাদের কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জানাই। আল্লাহ সকলের অনুবাদকে কবুল করুন। এই বইটির প্রুফ দেখে সহযোগীতা করেছেন ভাই মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সুজিৎ। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সেই সাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরয, মানুষ হিসেবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাদের চোখে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানালে খুশি হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে সঠিক পথের জন্য কবুল করেন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
০১/১২/২০১৯

সূচীপত্র

আমাকে ক্ষমা করুন/৭
ভালোবাসার একটি কথা/৭
প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য/৮
একটি প্রমাণ/৮
সত্য সাক্ষ্য/৯
একটি বড় সত্য/১০
মৃত্যুর পর/১১
পুণর্জন্মের বিরুদ্ধে ৩টি প্রমাণ/১২
কর্মের ফল পাওয়া যাবে/১৩
আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা সবচেয়ে বড় পাপ/১৩
একটি উদাহরণ১/৪
পবিত্র কুরআনে মূর্তিপূজার বিরোধিতা /১৫
একটি ভুল ধারণা/১৬
সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠতম পূণ্য ঈমান/১৬
সত্য ধর্ম/ ১৭
অবতার/১৮
যেভাবে শুরু হলো মুর্তিপূজা/১৯
নবীগণের শিক্ষা/২০
শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম/২১
সত্যের আহ্বান/২৩
মানুষের একটি বড় দুর্বলতা/২৩
বাধা ও কঠিন পরীক্ষা/২৩
সত্যের বিজয়/২৪
শেষ উপদেশ/২৫
সকল মানুষের দায়িত্ব/২৬
সত্য ধর্ম শুধু একটি/২৭
পণ্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত/২৮
ঈমানের প্রয়োজন/২৯
খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা/২৯
ঈমানের পরীক্ষা/৩০
আপনার দায়িত্ব/৩০
ঈমান গ্রহণের পর/৩১

কিছু কথা

একটি অবুঝ শিশু সামনের দিক থেকে খালি পায়ে হেটে আসছে। আর এই কচি পা দুটো যদি আগুনের দিকে যায়, তাহলে আপনি কী করবেন? শিশুটিকে আপনি সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিবেন। তাকে আগুন থেকে বাঁচাতে পেরে অফুরন্ত শান্তি অনুভব করবেন। এমনিভাবে কোনো মানুষ যদি আগুনে জ্বলে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে তার জন্য আপনার অন্তর অস্থির হয়ে উঠবে। মানুষটির প্রতি আপনার সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। আপনি কি কখনো ভেবেছেন এমনটি কেন হয়? এর কারণ হলো সকল মানুষ একই আদি মাতা-পিতা আদম-হাওয়ার সন্তান। প্রতিটি মানুষের বুকে রয়েছে একটি হৃদয়। যেখানে আছে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি। সে অন্যের কষ্টে ব্যথিত হয়। তার সহযোগিতা করে আনন্দ পায়। তাই তিনিই প্রকৃত মানুষ, যার অন্তরে পুরো মানবজাতির জন্য ভালোবাসা থাকে। যার প্রতিটি কাজ হয় মানুষের সেবার জন্য। কারো দুঃখ-দুর্দশা দেখে অস্থির হয়ে যায়। তার সহযোগিতা করা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়।

মানুষের জন্য দুনিয়ার এই জীবন অস্থায়ী। মৃত্যুর পর আর একটি জীবন আসবে, সেটাই হবে চিরস্থায়ী। সে জীবন কখনো শেষ হবে না। সত্য মালিকের পূজা ও আনুগত্য ছাড়া কেউ মৃত্যুর পরের জীবনে স্বর্গ পাবে না। বরং চিরকালের জন্য তাকে নরকের আগুনে জ্বলতে হবে।

আজ আমাদের লক্ষ-কোটি ভাই-বোন না জেনে না বুঝে নরকের জ্বালানি হতে চলেছে। এমন পথে চলছে যা সোজা নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যারা আল্লাহর জন্য মানুষকে ভালোবাসে, মানবতার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের দায়িত্ব হলো মানবতা নিয়ে

এগিয়ে আসা। এসব মানুষকে আগুন থেকে বাঁচানো নিজের ফরজ দায়িত্ব মনে করা।

আমরা আনন্দিত যে, মানুষের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, পথহারা মানুষদের নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য অস্থির থাকা, মানবতার নিখাদ দরদী মাওলানা মোহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী সাহেব আপনাদের সেবায় মুহাব্বত ও ভালোবাসার কিছু ফুল পেশ করেছেন। যার মাঝে মানুষের জন্য ভালোবাসা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকৃত মুসলমান হিসেবে প্রত্যেকের উপর যে কর্তব্য ছিল হৃদয়গ্রাহী এ নিবেদন দ্বারা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব সেই ফরজ দায়িত্ব আদায় করেছেন।

হৃদয়-নিংড়ানো কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আপনার সেবায় আপনার প্রাপ্য আমানত হিসেবে পেশ করলাম।

ওয়াসী সুলাইমান নদভী
সম্পাদক, মাসিক আরমুগান
ফুলাত, মুজাফফর নগর, ইউ পি, ভারত

শুরু করছি অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালার নামে

আমাকে ক্ষমা করুন

হে আমার প্রিয় ভাই ও বোন! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার ও সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পরে আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এখনও আপনার কাছে পৌঁছে দেইনি।

পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন হলো শয়তান। সে পাপের পরিবর্তে পাপীর অসম্মান মানুষের অন্তরে বসিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত পৃথিবী একটি যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়েছে। আমাদের এই বিরাট ভুলের প্রতি খেয়াল করেই আমি আজ এ কারণেই কলম উঠিয়েছি, যেন আপনার হক আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি। কোন ধরণের লোভ-লালসা ছাড়াই ভালোবাসার বার্তাগুলো আপনাকে বলছি।

সেই সত্য মালিক যিনি মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানেন তিনি সাক্ষী, এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লেখায় মনের ব্যথাময় কথাকে গভীর নিষ্ঠার সাথে আপনার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে প্রকৃত ও খাঁটি ভালোবাসার হক আদায় করতে চাই। এই কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছাতে না পারার বেদনায় বহু রাত আমি ঘুমাতে পারিনি।

ভালোবাসার একটি কথা

এটি বলার কথা নয়। তবে আমার আশা যে, আমার এই ভালোবাসাপূর্ণ কথাগুলো আপনার অন্তরের চোখ দ্বারা দেখবেন এবং (হৃদয় দিয়ে) পড়বেন (ও অনুধাবন করবেন)। সেই মালিকের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবেন যিনি পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যাতে আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে যে, আমি আমার ভাই ও বোনের কাছে সত্য আমানত পৌঁছিয়েছি। আর আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই হওয়ার দায়িত্ব পালন করেছি।

একজন মানুষকে এই দুনিয়ায় আসার পর যে সত্য জানা ও মানা সবচেয়ে জরুরি এবং যা তার জন্য সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য, সেই ভালোবাসাপূর্ণ কথা আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য

এই পৃথিবী ও প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য হলো, সকল সৃষ্টিজীব এবং পুরো পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃতির এই নিয়ম পরিচালনাকারী মালিক শুধুমাত্র একজন। তাঁর সত্ত্বা, গুণাগুণ ও ইচ্ছার মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। দুনিয়া সৃষ্টি, পারিচালনা ও জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে তার কোনো অংশীদার নেই। তিনি এমন এক মহাশক্তির অধিকারী, সকল স্থানে যার ক্ষমতা বিদ্যমান।

তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সারা পৃথিবীতে একটি পাতাও নড়তে পারে না। প্রতিটি মানুষের মন এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দেয়। চাই সে মূর্তিপুজারী হোক অথবা যে কোন ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। কিন্তু তার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে যে- সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, প্রকৃত মালিক তো শুধু একজনই।

মানুষের বিবেকেও এছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা আসে না। বিবেকও সাক্ষ্য দেয়- সারা পৃথিবীর মালিক একজনই। কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি দুইজন হয়, তাহলে সে স্কুল চলতে পারে না। একটি গ্রামে যদি দুইজন মেম্বার (নেতা) হয় গ্রামের নিয়ম-কানুন এলোমেলো হয়ে যাবে। কোন দেশে একইসাথে দুইজন প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারে না। তাহলে বলুন, এই বিশাল পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা একাধিক মালিকের মাধ্যমে কীভাবে চলতে পারে? দুনিয়া পরিচালনাকারী কয়েকজন সত্ত্বা কীভাবে হতে পারে?

একটি প্রমাণ

পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। দুনিয়ার কাছে আল্লাহ তাঁর সত্যতা বলতে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন-

“আমি আমার বান্দার উপর যা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, এতে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে (যে এই কুরআন মালিকের সত্য বাণী কিনা) তাহলে এর মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে এসো। আর যদি চাও এই কাজের জন্য আল্লাহ্কে ছাড়া পৃথিবীর সকলকে

সাহায্যকারী হিসেবে (সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে এসো। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”[১]

চৌদ্দশত বছর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক, বিজ্ঞ বিশ্লেষকগণ গবেষণা করে ব্যর্থ হয়ে গেছেন। আর সত্যের কাছে নিজেদের মাথা নত করে গেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- আজ পর্যন্ত কেউ আল্লাহ্‌র বিরাট চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

পবিত্র কালামের মালিক আমাদের বিবেককে উদ্দেশ্য করে অনেক প্রমাণাদী পেশ করেছেন। একটি উদাহরণ শোনাই-

“যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকতো, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।”[২]

কথা পরিষ্কার। একজন ছাড়া যদি কয়েকজন মালিক থাকতো, তাহলে মালিকদের মধ্যে লড়াই সৃষ্টি হয়ে যেত। একজন বলতো- এখন রাত হবে। অন্যজন বলতো - না, এখন দিন হবে। একজন বলতো- ছয় মাসে দিন হবে। দ্বিতীয়জন বলতো- তিন মাসে দিন হবে। একজন বলতো- সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে।

বাস্তবেই যদি দেব-দেবীদের এই অধিকার থাকতো, তারা যদি আল্লাহর কাজে অংশীদার হতো, তাহলে কখনো এমন হতো- কোন এক পূজারী বৃষ্টির দেবতার পূজা অর্চনা করে বৃষ্টি মঞ্জুর করিয়ে নিলো। এবার বড় মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো- এখন বৃষ্টি হবে না। তখন, নিচের দেবতারা ধর্মঘট ডাকতো। এদিকে মানুষ সূর্য উঠার অপেক্ষা করছে, কী ব্যাপার ! এখনো প্রভাত হচ্ছে না! পরে জানা গেল, সূর্যদেবতা ধর্মঘট করছে।

সত্য সাক্ষ্য

দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সাক্ষ্য দিচ্ছে- সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে দুনিয়ার চলমান নিয়ম সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পৃথিবীর মালিক শুধুমাত্র একজনই। শুধুই

[1] সূরা বাকারা-৩১
[2] সূরা আম্বিয়া-২২

একজন তিনি; যখন যা চান, তাই করতে পারেন। তাকে কল্পনা ও স্মৃতিতে আবদ্ধ করা যায় না। তার ছবি বানানো যায় না।

এই মালিক সারা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার এবং তাদের সেবার জন্য। সূর্য, বাতাস- সবকিছুই মানুষের সেবক তথা খাদেম। এই মাটিও মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আগুন, পানি, জীব ও জড়- প্রতিটি সৃষ্টিকেই মানুষের খেদমতের জন্য বানানো হয়েছে। মালিক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাস বানিয়ে। শুধুমাত্র মালিকের দাসত্ব এবং নির্দেশ পালন করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি যাতে সে দুনিয়ার সকল কাজ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। সাথে সাথে মালিক যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

ইনসাফের কথা হলো- সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আহারদাতা, জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণকারী তিনি যেহেতু কেবলই একজন। তাই একজন প্রকৃত মানুষের কর্তব্য হবে, তার জীবন সংশ্লিষ্ট সকল কাজ তাঁর আনুগত হয়ে তাঁর খুশিমত করা। কেউ যদি এক মালিকের হুকুম না মেনে জীবনযাপন করে, তাহলে সঠিক অর্থে তাকে মানুষ বলা যায় না ।

একটি বড় সত্য

প্রকৃত মালিক তাঁর সত্যগ্রন্থ কুরআনে সত্য বাণীসমূহের মাঝে একটি বাণীতে আমাদেরকে বলেছেন-

“প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।”[৩]

এই আয়াতের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে বলা হয়েছে- প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এটা এমন একটি কথা যা সকল ধর্ম, শ্রেণী এবং স্থানের মানুষ বিশ্বাস করে। বরং যারা ধর্ম মানে না, তারাও এই বাস্তব সত্যের সামনে মাথা নত করে। জীবজন্তুও মৃত্যুর বাস্তবতাকে বুঝে। ইঁদুর বিড়ালকে দেখলে পালিয়ে যায়। একটি কুকুর রাস্তায় গাড়ি আসতে দেখলে জীবন বাঁচানোর জন্য রাস্তা থেকে সরে

[3] সূরা:আনকাবুত, ২৯:৫৭

যায়। কারণ তার এতটুকু বুঝ আছে যে, এমনটি যদি না করা হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

মৃত্যুর পর

এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে কুরআনুল কারীমে আরো একটি মহাসত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটা যদি মানুষ বুঝে তাহলে পৃথিবীর পরিবেশ বদলে যাবে। সেই সত্যটি হলো, তোমাদের মৃত্যুর পর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর এই দুনিয়াতে যে যেমন কর্ম করেছে, সেই অনুযায়ীই পরকালে সে বিনিময় পাবে।

মৃত্যুর পর তোমরা মাটির সাথে মিশে পঁচে ও গলে যাবে। এমনটি নয় যে, দ্বিতীয়বার আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে না। এটাও সত্য নয় যে, মৃত্যুর পর তোমাদের আত্মা অন্য কোনো শরীরে প্রবেশ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনভাবেই মানুষের জ্ঞানের কষ্টিপাথরে টিকতে পারে না।

প্রথম কথা হলো, পুণর্জন্মের কথা হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদেও কোথাও উল্লেখ নেই। পরবর্তী পুরাণগুলোতে (দেব- দেবীদের কাহিনীতে) কিছু বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যা নিছক মানুষের ধ্যান-ধারণা ও কাল্পনিক কিচ্ছা- কাহিনী। এই দৃষ্টিভঙ্গির শুরুতে শয়তান ধর্মের নামে উঁচু-নিচু জাতির ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দিলো। ধর্মের নামে শুদ্রদের থেকে সেবা গ্রহণ করা এবং তাদেরকে নিম্ন শ্রেণী হিসেবে প্রচার করলো। ধর্মের ঠিকাদারদের কাছে সমাজের দলিত লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করলো যে, আমাদের স্রষ্টা সকল মানুষকে চোখ, কান, নাক, সবকিছু একই রকম বানিয়েছেন, তাহলে আপনারা নিজেদেরকে সম্মানিত আর আমাদেরকে নিচু ও তুচ্ছ মনে করেন কেন? তখন তারা পুণর্জন্মের দোহাই দিয়ে উত্তর দিল যে, তোমাদের পূর্বের জীবনের মন্দ কাজ তোমাদেরকে এই জন্মে নিচু ও তুচ্ছ বানিয়ে দিয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সকল আত্মা দুইবার জন্মগ্রহণ করে। নিজ কর্মের ফল হিসেবে দেহ পরিবর্তন করে আসে। যারা মন্দকাজ করে তারা জীব-জন্তুর আকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে। এর চেয়েও যারা বেশি

মন্দকাজ করে তারা উদ্ভিদ-তরুলতার আকৃতিতে ফিরে আসে। আর যার কাজ ভালো হয় পুনর্জন্মের চক্র থেকে সে মুক্তি লাভ করে।

পুণর্জন্মের বিরুদ্ধে ৩টি প্রমাণ

১.

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণকথা হলো- বিজ্ঞানীদের ভাষ্য মতে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে বৃক্ষলতা। এরপর জীবজন্তু, এর বহু বছর পর সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। যখন দুনিয়াতে কোন মানুষই সৃষ্টি হয়নি, কোনো মানুষের আত্মা তখনও কোন মন্দ কাজ করেনি। এখন প্রশ্ন হলো, লক্ষ লক্ষ বছর যে অসংখ্য জীবজন্তু ও গাছপালা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো তাহলে কাদের আত্মা ছিলো?

২.

দ্বিতীয় বিষয় হলো, পুণর্জন্মের এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেওয়ার পর ধারাবাহিক ভাবে জীবজন্তুর সংখ্যা কমার কথা ছিল। যেসব আত্মা পুণর্জন্মের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেছে, সেগুলোর সংখ্যা তো কম হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো- পৃথিবীতে জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা সব কিছুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৩.

তৃতীয় বিষয় হলো, দুনিয়াতে জন্মগ্রহণকারী আর মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে সংখ্যায় আসমান জমিনের ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে। মৃত্যুবরণকারীর তুলনায় জন্মগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। কোটি কোটি অগণিত শুধু মাছিই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যুবরণকারী মানুষের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম।

আমাদের দেশে কিছু শিশুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, সে অমুক স্থানকে চিনতে পারে, যেখানে সে পূর্বের জন্মে ছিল। তার পুরোনো নামও বলে দেয়। এও বলে যে, সে দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়েছে। আসলে এসব কথার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরণের জিনিস, বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ, অথবা আত্মিক-সামাজিক পরিবেশের উল্টো আমলের প্রতিফলন। সঠিকভাবে এর চিকিৎসা করা উচিত।

আমল বা বাস্তবতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান এসকল শিশুর ওপর ভর করে থাকে।)
সত্য কথা হলো এই সত্যের বাস্তবতা মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের সামনে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। মানুষ দেখবে- সে দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করেছে মৃত্যুর পর সকলকে সেই এক মালিকের কাছে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হচ্ছে।

কর্মের ফল পাওয়া যাবে

মানুষ যদি তার প্রতিপালকের উপাসনা করে, তাঁর কথা মেনে ভালো কাজ করে, ভালো ও কল্যাণের পথে চলে, তাহলে সে তার প্রতিপালকের কৃপায় জান্নাত পাবে। আল্লাহ্ তায়ালা সুখ-শান্তির সকল উপকরণ জান্নাতে রেখেছেন। সেখানে তো আরাম-আয়েশের এমন জিনিস রয়েছে যা এই দুনিয়ার কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, কোন অন্তর তা কল্পনাও করতে পারে না।

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে, জান্নাতী মানুষ সেখানে নিজ চোখে তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। যার মত আনন্দ ও খুশির জিনিস আর কিছুই হতে পারে না।

এমনিভাবে যারা মন্দ কাজ করবে, নিজ প্রতিপালকের সাথে উপাস্য হিসাবে অন্য কাউকে অংশীদার বানাবে, অহংকার করে নিজ মালিকের অবাধ্য হবে, তাকে (অন্যদের হিসাব শুরুর পূর্বেই) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে চিরকাল আগুনে জ্বলতেই থাকবে। সেখানে তার পাপের শাস্তি দেয়া হবে। সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে- সে তার মালিকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হবে। আর তার উপর মালিকের পক্ষ থেকে থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা সবচেয়ে বড় পাপ

সত্য ও প্রকৃত মালিক তার কিতাব কুরআনে আমাদেরকে বলেছেন, ভালো ও সৎ কাজ ছোটও হয়, বড়ও হয়। তেমনিভাবে ঐ মালিকের কাছে অপরাধ, মন্দকাজ, পাপ ছোট-বড় হিসেবে আছে। তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন- সেই পাপ সম্পর্কে যেই পাপ মানুষের সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তির কারণ হবে, যেই পাপ ও পাপের শাস্তি তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না, যেই পাপ করার কারণে চিরকাল নরকে

জ্বলবে, নরক থেকে বের হতে পারবে না, পাপী ব্যক্তি মৃত্যুর আশা করবে কিন্তু কখনোও মৃত্যু আসবে না। সেই মহাপাপটি হলো- এক মালিকের সত্ত্বা, তার গুণাবলী ও তাঁর ইচ্ছার মধ্যে কাউকে অংশীদার বানানো অর্থাত শিরক করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা, অন্য কাউকে পূজার উপযুক্ত মনে করা, মৃত্যুদাতা, জীবনদাতা, আহারদাতা, ভালো মন্দের মালিক অন্য কাউকে মনে করা সবচেয়ে বড় পাপ তথা চূড়ান্ত পর্যায়ের জুলুম। চাই কোন দেবদেবীকে মানা হোক অথবা চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পীর, ফকির যে কোন কাউকে ঐ মালিকের সত্ত্বা ও গুণাবলীর সমকক্ষ মনে করা হোক না কেন তা হলো শিরক। শিরকের পাপ আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা তার অন্য যে কোন পাপ ক্ষমা করেন। এই পাপকে আমাদের বিবেকও খারাপ মনে করে, আমরাও এমন কাজকে অপছন্দ করি।

একটি উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, কারো স্ত্রী খুবই বদমেজাজ স্বভাবের। অল্প একটু কথাতেই ঝগড়া লেগে যায়। কোন কথা শোনেও না, মানেও না। স্বামী যদি তাকে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলে, তখন স্ত্রী বলে, আমি আপনারই হয়ে থাকব। আমি তো আপনারই। আপনার কাছেই মরবো। এক পলকের জন্যও আপনার কাছ থেকে দূরে যাবো না। তাহলে স্বামী কঠিন রাগের পরও সেই রাগ নিভাতে বাধ্য হবে।
অন্যদিকে, যদি কারো স্ত্রী খুবই ভালো সেবিকা হন, স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানেন, স্বামীর অনেক যত্ন-পরিচর্যা করেন, স্বামী যদি অর্ধরাতে বাসায় ফিরে, তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, খাবার গরম করে তার সামনে পেশ করেন, তার সাথে খুব ভালোবাসার কথা বলেন- সেই স্ত্রী একদিন স্বামীকে বললেন, আপনি আমার জীবন সঙ্গী। কিন্তু শুধু আপনার দ্বারা আমার কাজ চলে না, তাই আমার অমুক প্রতিবেশীকে আজ থেকে আমার স্বামী বানিয়ে নিলাম। স্বামীর যদি নূন্যতম আত্মমর্যাদাবোধ থাকে তাহলে সে তা সহ্য করতে পারবে না। সে এক মূহুর্তের জন্যও এই বেহায়া মাহিলাকে তার কাছে রাখা পছন্দ করবে না।

বিষয়টি এমন কেন? শুধুমাত্র এজন্য যে স্বামী তার নিজের অধিকারের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে চায় না। এক ফোঁটা পানি হতে জন্ম নেয়া মানব সন্তান যদি অন্য কাউকে নিজের সাথে ভাগাভাগি করাকে পছন্দ না করেন, তাহলে সমস্ত কিছুর সেই মালিক যিনি দুর্গন্ধযুক্ত এক ফোঁটা নাপাক পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাঁর সৃষ্টি মানুষ তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে, তিনি ছাড়া অন্য কারো পূজা- ইবাদত করবে, অন্যকে মানবে, তিনি কীভাবে সহ্য করবেন? দুনিয়াতে যাকে যা কিছু দিয়েছেন তিনিই দান করেছেন। যখন কোনো পতিতা নারী নিজের ইজ্জত সম্মান বিক্রি করে অন্যকে নিজের উপর অধিকার বসানোর সুযোগ দেয়। তখন সে মানুষের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তুচ্ছ হয়ে যায়। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তিও তাঁর মালিকের দৃষ্টিতে আরো ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায় যে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পূজা করে। চাই সে কোন দেবতা, ফেরেশতা, জীন, মানুষ, প্রতিমা, মূর্তি, কবরস্থানের বাসিন্দা বা অন্য কোনো মনচাহি জিনিসের উপাসনা করুক না কেন।

পবিত্র কুরআনে মূর্তিপূজার বিরোধিতা

কুরআন শরীফে মূর্তিপূজার একটি সুন্দর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

“আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে (মূর্তি, কবরবাসী) ডাকো, তারা সবাই একত্র হয়ে একটা মাছিও বানাতে পারে না। (সৃষ্টি তো দূরের কথা) যদি কোনো মাছি তাদের সামনে থেকে কিছু (যেমন প্রসাদের কণা) ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তবে তারা তা ফিরিয়ে নিতে পারে না। কতই না দুর্বল এই পূজ্য (যার পূজা করা হয়)! আর কতই না দুর্বল এই পূজারিরা (যারা পূজা করে) ! তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।”[4]

কত সুন্দর উদাহরণ! স্বয়ং আল্লাহ্ই তো স্রষ্টা। নিজ হাতে তৈরি মূর্তি ও প্রতিমার নির্মাতা মানুষই বেখবর-উদাসীন। (সে কেন সৃষ্টির উপাসনা করবে? সে তো ইবাদত করবে তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র।) মূর্তির

[4] সূরা হজ্জ: ৭৩-৭৪

মাঝে সামান্য বোধশক্তি থাকলে সে-ই তো মানুষের ইবাদত-উপাসনা করতো।

একটি ভুল ধারণা

কিছু মানুষ বলে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে মালিকের পথ দেখিয়েছে। তাদের মাধ্যমে মালিকের অনুগ্রহ অর্জন করি। এর উদাহরণ হলো এমন, কেউ কুলির কাছে ট্রেনের ব্যাপারে জানতে চাইলো। কুলি যখন ট্রেনের ব্যাপারে বললো, তখন ঐ ব্যক্তি ট্রেন বাদ দিয়ে কুলির উপর উঠে বসলো। এমনিভাবে আল্লাহর প্রতি সঠিক পথপ্রদর্শকের অবস্থাও ঠিক তেমন। যেমন ট্রেন ছেড়ে কুলির ঘাড়ে চড়ে বসার মতো।

কিছু ভাই বলেন, শুধু ধ্যান জমানোর জন্য এবং মনোনিবেশ করার জন্য মূর্তিগুলো সামনে রাখি। এটাও এমন যে, কেউ একটি খুঁটির প্রতি মনোনিবেশ করে ধ্যান করে দেখছে। আর বলছে বাবার প্রতি ধ্যান জমানোর জন্য খুঁটির প্রতি তাকিয়ে আছি। কোথায় পিতা, আর কোথায় খুঁটি? কোথায় এই দুর্বল মূর্তি, আর কোথায় সবচাইতে শক্তিশালী দয়াবান করুণাময় মালিক? এর দ্বারা কি ধ্যান বা মনোনিবেশ বাড়বে নাকি কমবে?

সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠতম পূণ্য ঈমান

সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠতম পূণ্য হলো ঈমান। ঈমানের ব্যাপারে দুনিয়ার সকল ধর্মের ধার্মিক-পূণ্যবানরা বলে থাকেন। দুনিয়াতে সবাইকে সবকিছু রেখে যেতে হবে। মৃত্যুর পর মানুষের সাথে যাবে শুধুই ঈমান। যে মানুষ হকদারের হক পরিশোধ করে দেয় তাকে ঈমানদার বলে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করে তাকে বলে জালেম। মানুষের উপর সবচেয়ে বড় হক হলো তার সৃষ্টিকর্তা মালিকের। তিনি হলেন সকলের স্রষ্টা, মৃত্যুদাতা, জীবনদাতা, উপকার-ক্ষতি করার মালিক, ইজ্জত ও সম্মানদাতা, আল্লাহর দেয়া জীবন তার খুশিমত ও তার আনুগত্যের সাথে পালন করা ও তাকে মানার নামই হলো ঈমান। আল্লাহ্‌র একত্বকে মানা ছাড়া এবং তার আনুগত্য করা ছাড়া কোন মানুষ ঈমানদার বা ঈমান ওয়ালা হতেই পারে না। বরং তাকে বেঈমান বা কাফের বলা হয়।

মালিকের সবচেয়ে বড় অধিকারকে অমান্য ও অসম্মান করে মানুষের সামনে নিজের ঈমানদারি প্রকাশ করা, এর উদাহরণ হলো সেই ডাকাতের মতো যেই ডাকাত অনেক ছিনতাই-লুটপাট করে ধনী-সম্পদশালী হয়েছে। আর দোকানে গিয়ে দোকানদারকে বলছে, আপনার একটি টাকা আমার কাছে বেশী চলে এসেছে, আপনার টাকাটা আপনি নিন। এত টাকা লুণ্ঠন করার পর এক টাকার হিসাব দেয়া কেমন বেঈমানি? নিজ মালিককে ছেড়ে অন্য কারো উপাসনা করার অপরাধ এর থেকেও নিকৃষ্ট বেঈমানি। (সেটা বিন্দুমাত্র কোন ঈমানের পরিচয়ই নয়।)

মানুষ তার মালিককে এক বলে মানবে, সেই একজনেরই ইবাদত তথা দাসত্ব করবে- এটাই হলো ঈমান। আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নির্দেশ পালন করে জীবনকে পরিচালনা করাকে ধর্ম বলে। তার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করাকে বলে বেদীনী বা ধর্মহীনতা।

সত্য ধর্ম

সত্য ধর্ম শুরু থেকে একটিই ছিলো, আছে ও থাকবে। তার শিক্ষা হলো সেই একজনকেই মানতে হবে। তার নির্দেশমত চলতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেন-

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।”[৫]

“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করে, কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে মহা ক্ষতিগ্রস্ত।”[৬]

মানুষের দুর্বলতা হলো তার দৃষ্টি নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্ত দেখতে পারে। তার কান নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শুনতে পারে। ঘ্রাণ, স্বাদ, ও স্পর্শ শক্তিরও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে।

এমনিভাবে বিবেক-বুদ্ধির পরিসীমাও একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

---

[5] আল ইমরান-১৯

[6] সূরা আল ইমরান-৮৫

সেই মালিক কী ধরণের জীবন পছন্দ করেন? কীভাবে তার ইবাদত করতে হবে? মৃত্যুর পর কী হবে? কারা জান্নাত পাবে? এমন কি কাজ যার কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে? এসব বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি শুধুমাত্র মানুষের নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না।

অবতার

মানুষের এই দুর্বলতার প্রতি দয়া করে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তিনি যোগ্য মনে করেছেন, সে সকল মহান মানুষের উপর রিসালাত (আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের আদেশ-নিষেধ প্রচার-প্রসার করা ও শেখানো) - এর দায়িত্ব দিয়েছেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বার্তা অবতীর্ণ করেছেন।

এ সকল অবতার তথা পয়গম্বরগণ মানুষকে জীবন-যাপন, উপাসনা তথা দাসত্বের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। জীবনের ঐ বাস্তবতার সংবাদ বলেছেন যা মানুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝতে পারে না। এমন মহান সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নবী, রাসূল বা অবতার বলা হয়। মনে রাখবেন, অবতার হলো মানুষ যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু আজকাল অবতার বলতে মনে করা হয়, মালিক মানুষের আকৃতিতে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটা হলো মিথ্যা ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাস। এটা অনেক বড় পাপ। এই মনগড়া ধারণা মানুষকে এক মালিকের উপাসনা থেকে দূরে সরিয়ে মূর্তি পুজায় লিপ্ত করে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সত্য পথ দেখানোর জন্য সেই মহামানবগণকে নির্বাচিত করেছেন যাদের নবী ও রাসূল বা অবতার বলা হয়। প্রত্যেক জনগোষ্ঠির কাছেই তাঁরা এসেছেন। সকল মানুষকে এক আল্লাহ্‌কে মানা, শুধু একজনেরই ইবাদত করা এবং তাঁর খুশিমত জীবন-যাপনের পদ্ধতি ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিখিয়েছেন। বিধিবিধান নিয়মিত পালন করতে বলেছেন। তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকেও এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদতের দাওয়াত দেননি। বরং সকলেই শিরককে ভয়ানক ও বড় অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সকলকেই সবচেয়ে বড় গুনাহ থেকে বিরত রেখেছেন। মানুষ তাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং সত্য পথে চলেছেন।

যেভাবে শুরু হলো মুর্তিপূজা

সকল নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ ছিলেন সৎ ও ভালো মানুষ। তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী-রাসূল ও সৎ লোকদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ তাদের বিরহে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের কথা স্বরণকরে খুব কান্না কাটি করতো। শয়তান সুযোগ পেয়ে গেল। সে মানুষের দুশমন ও প্রকাশ্য শত্রু। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে এমন শক্তি দিয়েছেন, যার দ্বারা সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং মানুষের অন্তরে খারাপ কথা প্রবেশ করাতে পারে। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান কে তার আসল সৃষ্টিকর্তা মালিককে মানে আর কে শয়তানকে মানে।

শয়তান মানুষের কাছে এসে বললো, তোমরা তোমাদের নবী-রাসূল ও বুযুর্গদেরকে খুব ভালোবাসো। তোমাদের ভালোবাসা তাদের প্রাপ্যও বটে। মৃত্যুর পর তারা তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তাদের কথা ফেলে দেন না। তাই আমি তাদের একটি মূর্তি বানিয়ে দিচ্ছি। সেটা দেখে তোমরা প্রশান্তি লাভ করবে। শয়তান মূর্তি বানালো। তাদের যখন মন চাইতো তারা সেটা দেখে নিত। ধীরে ধীরে সেই মূর্তির প্রতি ভালোবাসা যখন তাদের অন্তরে বসে গেল। শয়তান তাদেরকে বলল- এই নবী রাসূল ও বুযুর্গগণ আল্লাহর অনেক প্রিয়। তোমরা যদি এই মূর্তির সামনে মাথা নত কর, তাহলে তোমরাও আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের মনের আশা পূরণ করে দেবেন। তোমরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের অন্তরে আগেই মূর্তির ভালোবাসা প্রবেশ করেছিল। তাই তারা মূর্তির সামনে মাথা নত করা ও তার পুজা শুরু করে দিল। উপাসনার উপযুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহ্। মানুষ তাকে ছেড়ে মূর্তির পুজা শুরু করে দিল এবং শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। যখন সে আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা শুরু করলো, তখন নিজের ও অন্যের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে গেল। মালিকের দৃষ্টি থেকে ছিটকে পড়লো। তাদের ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা আবার রাসূল পাঠালেন। রাসূলগণ শুধু মূর্তি পূজা নয় বরং সকল প্রকারের শিরক, জুলুম, অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত

সকল খারাপ কাজ ও দুঃশ্চরিত্রতা থেকে মানুষদেরকে ফেরাতেন। কিছু মানুষ তার কথা মানলো, আর কিছু লোক তার অবাধ্যতা করলো। যারা কথা মেনেছে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ও খুশি হয়েছেন। আর যারা তার উপদেশের বিরোধিতা করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নবীগণের শিক্ষা

একের পর এক নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে আসতেই থাকেন। তাঁদের ধর্মের ভিত্তি হতো এক। তাঁরা একটি ধর্মের দিকেই ডাকতেন। বলতেন- তোমরা এক আল্লাহ্কে মেনে চলো। তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে কাউকে যুক্ত করো না। তাঁর সকল রাসূলকে সত্য মনে কর। তাঁর ফেরেশতারা তাঁর বান্দা ও পবিত্র সৃষ্টি। তারা পানাহার করে না, ঘুমায় না, প্রতিটি কাজে মালিকের আনুগত্য সহকারে পালন করে। তারা কখনো আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না। তারা আল্লাহর প্রভূত্বের ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ফেরেশতার মাধ্যমে নবীদের উপর ওহী প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন- এ বিষয়গুলোকে সত্য মনে করবে। মৃত্যুর পর জীবিত হতে হবে, সেখানে ভালো মন্দ কর্মের বিনিময় পাওয়া যাবে- এর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাস করো- ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল জীবনে চলার বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন; সে অনুযায়ী চলো। যে সমস্ত মন্দ ও হারাম কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো বর্জন করো। যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন এবং তাদের কাছে যে পবিত্র গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো সত্য ছিল (কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের স্বার্থেও লোভে মানুষ সেগুলোতে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছে।) তাঁদের সবার উপর আছে আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। সত্য কথা হল, যারা আল্লাহকে এক মেনে সত্য বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাদের শিক্ষায় এক মালিককে ছেড়ে শুধু অন্যদেরই নয় বরং নিজেদের দিকে

পূজারও আহ্বান নাই, তাঁদের বিশ্বাস সত্য হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? যে সব মহাপুরুষের নিকট মূর্তিপুজা বা বহু উপাস্যের উপাসনার শিক্ষা পাওয়া যায়, হয়তো তাদের শিক্ষা পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। অথবা তারা রাসূল বা অবতারই নন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পূর্বের সকল রাসূলগণের শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কোথাও আবার ধর্মীয় গ্রন্থকেই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একটি মূল্যবান সত্য কথা হল, প্রত্যেক আগত নবী এবং রাসূলের মুখে এবং তাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থেও শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে- তিনি আসার পর, তার পরিচয় জানার পর সকল পুরনো শরীয়ত ও ধর্মের নিয়ম-কানুন ছেড়ে তার কথা মানতে হবে। তার মাধ্যমে আশা শেষ কিতাব পরিপূর্ণ ধর্মের উপর চলতে হবে। এটাও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ, পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলো পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ঐ মালিক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের খবর পরিবর্তন হতে দেননি। যাতে কেউ এ কথা না বলতে পারে যে, আমরা তো জানতাম না। বেদের মধ্যে তার নাম এসেছে নরাশংস। পুরাণে এসেছে কল্কি অবতার। বাইবেলে এসেছে ফারাকলিস্ত। বৌদ্ধ ধর্মে এসেছে শেষ বুদ্ধ ইত্যাদি।

উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম, জন্মের ইতিহাস ও অন্যান্য অনেক চিহ্ন পূর্ব হতেই বলে দেয়া হয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন ও পরিচয়

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪শত বছর পূর্বে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ শহর মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। মাতা আমেনাও বেশি দিন জীবিত থাকেন নি। প্রথমে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন তাঁর দাদা। তার ইন্তেকালের পর নবীজীর চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন। দুনিয়ার এই এতিম মানুষটি পুরো শহরের চোখের মণি হয়ে গিয়েছিলেন। দিন দিন বড় হতে

লাগলেন। তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা বেড়েই চললো। নবীজীকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে ডাকতে লাগলো। মানুষ তাদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে আমানত রাখতো। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে তাঁকে দিয়ে সমাধান করানো হতো। কাবা শরীফ ছিলো মক্কায়। আল্লাহ্র পবিত্র ঘর। যার পুণর্নির্মাণ করা হচ্ছিলো। তার দেয়ালের এক কোণে একটি পবিত্র পাথর ছিলো। সেই পাথরটি যখন যথাস্থানে রাখার সময় হলো, এই পবিত্রতার কারণে সকল গোত্রের নেতাদের ইচ্ছা ছিল, পবিত্র পাথরটি রাখার সৌভাগ্য যেন তারা অর্জন করে। তাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া লেগে যায়। এমনকি তারা তরবারি উন্মুক্ত করে ফেলে। তখন একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি সিদ্ধান্ত দিলেন- আগামীকাল সর্বপ্রথম যে ব্যাক্তি কাবায় আসবে, সে এর সিদ্ধান্ত দেবে। এই সিদ্ধান্ত সকলে মেনে নিবে। সেদিন সর্বপ্রথম কাবায় যিনি এলেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলেই বলে উঠলো- আমাদের মাঝে সত্যবাদী ও ঈমানদার ব্যাক্তি এসে গেছে। আমরা সকলেই রাজি ও খুশি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাদর বিছালেন এবং তাতে সেই পাথরটি রাখলেন। সকল গোত্রের নেতাদের দিয়ে সেই চাদর উঠালেন। পাথরটি নিয়ে যখন দেয়ালের কাছে গেল, নবীজী নিজ হাতে পাথরটি জায়গা মত বসিয়ে দিলেন। আর সকলেই একটি বড় যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল। মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল ভাল কাজে আগে আগে পেত। তিনি যখন সফরে যেতেন তখন মানুষ অস্থির হয়ে যেত। তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন, লোকজন তাঁকে ধরে জোরে জোরে কাঁদতো। সে সময় আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি রাখা ছিল।

পুরো আরব দেশে নারীদের উপর জুলুম, জাতিভেদ প্রথা, মদ, জুয়া, জিনা, আরো বহু নিকৃষ্ট পাপকাজের প্রচলন ছিল।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা শুরু করেন এবং নবীজীকে রাসূল হওয়ার সুসংবাদ দেন।

মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনা এবং আনুগত্যের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সত্যের আহ্বান

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটি আওয়াজ দিলেন। আওয়াজ শুনে মানুষ খুব দ্রুত একত্রিত হলো। কারণ এই আহ্বান ছিল একজন সত্যবাদী ঈমানদারের। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের পিছনে একটি বড় সৈন্যদল আসছে, আর তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাহলে কি তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করবে?

সকলে সমস্বরে বললো, এমন কে আছে যে আপনার কথা বিশ্বাস করবে না? আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না, দ্বিতীয়তঃ আমাদের তুলনায় আপনি পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে অপর দিকে দেখছেন। এরপর নবীজী মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। নবীজী জাহান্নামের ভয়ানক আগুনের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেন। শিরক ও মুর্তি পূজা থেকে বিরত থাকার আহ্বান করলেন।

মানুষের একটি বড় দুর্বলতা

মানুষের একটি দুর্বলতা হলো, সে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও প্রথা-রীতি চোখ বন্ধ করে অন্ধের মত মেনে চলে। সেটা যতই যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী হোক না কেন তারা বিবেক দিয়ে বিবচনা করতে চায় না। বরং পূর্বপুরুষদের প্রথা-মতবাদ আঁকড়ে ধরে থাকে। এর বিপরীতে কিছু শুনতে বা বুঝতে চায় না।

বাধা ও কঠিন পরীক্ষা

মক্কাবাসীদের জন্য দুর্ভাগ্য এটাই যে, তারা সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা-সম্মান করা, তাঁকে (আল-আমিন) চিরবিশ্বাসী ও চিরসত্যবাদী মানা সত্ত্বেও নবীজীর দীনের শিক্ষাকে গ্রহণ করলো না বরং শত্রুতে পরিণত হলো। নবীজী মানুষকে যত বেশি সত্যের দিকে আহ্বান করতেন, শিরকের বিরোধিতা করে তাওহীদ তথা একত্ববাদের দিকে ডাকতেন, মানুষ ততোই তাঁর বেশি শত্রুতা করতো। কিছু মানুষ তো ঈমানদারদেরকে

তথা যারা নবীজীর কথা বিশ্বাস করে ঈমান এনেছিলো সেই বিশ্বাসীগণের ওপর চরম নির্যাতন চালাতো।

এমন ছিল, যারা বিশ্বাসীদেরকে কষ্ট দিতো। মারপিট করত। এবং আগুনের অঙ্গারায় শুয়ে দিতো। গলায় দড়ি লাগিয়ে তাদের টানাহেঁচড়া করতো। তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করতো। কিন্তু নবীজী সকলের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন। কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কথা চিন্তাও করতেন না। সারা রাত মালিকের কাছে তাদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করতেন।

একবার নবীজী মক্কার লোকদের প্রতি আশাহত হয়ে তায়েফ শহরে চলে দেলেন। ওখানকার মানুষ এই সুমহান ব্যক্তিকে অপমান করলো। নবীজীর পিছনে দুষ্ট বখাটে ছেলেদেরকে লেলিয়ে দিলো। তারা নবীজীকে উত্যক্ত করতে লাগলো।

তারা নবীজীর গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলো। ফলে নবীজীর পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। ব্যথার কারণে নবীজী যদি কোথাও বসতেন তাহলে সেই দুষ্ট ও বখাটে ছেলেরা তাঁর পিছু লাগতো। তাঁকে বসতে দিতো না। তাকে উঠিয়ে আবার দরদী নবীজীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতো। এমতাবস্থায় নবীজী শহর থেকে বের হয়ে এক জায়গায় বসলেন। নবীজী তাদেরকে বদদু'আ করেননি। বরং মালিকের কাছে দু'আ করলেন, হে মালিক! তাদেরকে বুঝ দান করুন, তারা জানে না। এই সত্য বাণী এবং ওহী পৌঁছানোর কারণে নবীজীকে তাঁর প্রিয় শহর মক্কা ছাড়তে হলো। নবীজী তাঁর নিজের প্রিয় শহর মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেলেন। ওখানেও মক্কাবাসীরা সৈন্যদল তৈরি করে বারবার নবীজীর সাথে যুদ্ধ করেছে। তাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে।

সত্যের বিজয়

সর্বদা সত্যেরই বিজয় হয়। দীর্ঘ ২৩ বছরের প্রচেষ্টার পর নবীজী মানুষের অন্তরকে জয় করে ফেলেন। সত্যের পথে নবীজীর অদম্য প্রচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ দাওয়াত পুরো আরব দেশকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসে। পৃথিবীতে একটি মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়। মূর্তি পূজা বন্ধ হয়ে যায়। সমাজ থেকে উঁচু-নিচু জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ দূর

হয়ে যায়। সকল মানুষ এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সকল মানুষ এক আল্লাহ্‌কে মেনে চলে ও একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে থাকে।

শেষ উপদেশ

নবীজীর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রায় এক লক্ষ সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। সকলকে তাঁর শেষ উপদেশ প্রদান করেন। সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন- "হে লোক সকল! মৃত্যুর পরে কেয়ামত দিবসে সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। আমার ব্যাপারেও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। বিচার দিবসের মালিক আল্লাহ্‌ তায়ালা যদি প্রশ্ন করেন, আমি আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁর সত্য ধর্ম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি কিনা। তখন তোমরা কী জবাব দেবে?" সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁর সত্য ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি তার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করেছেন। নবীজী আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর নবীজী সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই সত্য ধর্ম যাদের কাছে পৌঁছেছে, তারা ঐ সকল লোকদের কাছে পৌঁছাবে, যাদের কাছে এখনো পৌঁছেনি।

নবীজী এই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, "আমি হলাম শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী আসবে না। আগমণের কথা তোমরা তো সব জানতে। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাঁকে ঠিক সেইরূপ চেনে, যেরূপ নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপণ করে।"[৭]

7 বাকারা ১৪৬

সকল মানুষের দায়িত্ব

কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তারা এক মালিকের দাসত্ব করবে। তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাবে না। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে । তাঁর আনিত ধর্ম ও জীবন অতিবাহিত করার জন্য যে বিধান নিয়ে তিনি এসেছেন তাঁর ওপর জীবনকে পরিচালিত করবে। ইসলামে এই নির্দেশগুলো মানার নামই হলো ঈমান। ঈমান গ্রহণ করা ছাড়া মারা গেলে কেয়ামতের দিন চিরস্থায়ী নরকে জ্বলতে হবে।

কিছু প্রশ্ন

কারো মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, মৃত্যুর পর স্বর্গ অথবা নরকে যাওয়া তো দেখা যায় না, তাহলে তা বিশ্বাস করবো কেন?

এই ক্ষেত্রে এটা জানা উচিত যে, সকল ঐশী গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায়, স্বর্গও নরকের ধারণা সকল ধর্মেই স্বীকৃত।

বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি। বাচ্চা যখন তার মায়ের পেটে থাকে, তখন তাকে যদি বলা হয়, যখন তুমি বাহিরে যাবে তখন দুধ পান করবে। আর বাহিরে এসে তুমি অনেক মানুষ এবং অনেক জিনিস দেখতে পাবে। পেটে থাকা অবস্থায় তার এই কথা সে বুঝবে না বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন সবকিছু প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত পাবে। এমনিভাবে সারা পৃথিবী একটি মাতৃগর্ভের মতো। মানুষ যখন মৃত্যুর পরে পরকালের জীবনে চোখ খুলবে, তখন সবকিছুই সে সামনে পাবে।

সেখানকার জান্নাত-জাহান্নাম এবং অন্যান্য বাস্তবতার খবর আমাদেরকে চিরবিশ্বাসী ও সত্যবাদী ব্যক্তি নিয়েছেন, যাকে তার শত্রুও কখনো মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি যাকে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ দেয়া হয়েছে। যার সত্যতা সকল মানুষই মেনে নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কারো অন্তরে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, সকল নবী ও রাসূল এবং তাদের আনীত ধর্ম ও ঐশী বাণী যদি সত্য হয়, তাহলে আবার ইসলাম গ্রহণ করার প্রয়োজন কি?

বর্তমান যুগে এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। আমাদের দেশে একটি পার্লামেন্ট রয়েছে। তার আইন ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। এখানে

যারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে সকলেই হিন্দুস্তানের প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শাস্ত্রী জি, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী ইত্যাদি। দেশের প্রয়োজনে সময়ের পরিবর্তনে যে কোনো আইন তারা প্রণয়ন করেছে, যেগুলো ভারতের আইনের অন্তর্ভুক্ত। এরপরও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রয়েছে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় যেসব আইন কানুন পরিবর্তন হবে, এর দ্বারা পুরাতন আইন কানুন শেষ হয়ে যাবে। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবশ্যকীয় হবে এই সংস্কারকৃত আইনকে মানা। এরপরও যদি কোন হিন্দুস্তানী নাগরিক এই কথা বলে যে, ইন্দিরা গান্ধী প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী ছিল। তাই আমি তার সময়ের আইন মানবো। এই নতুন প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন করা সংশোধিত আইন আমি মানবো না। আর তার আরোপ করা ট্যাক্স আমি দিব না। তাহলে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে সকলেই বলবে, সে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সকল ঐশী ধর্ম এবং ঐশী গ্রন্থের মধ্যে সেই যুগের সত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। আমাদের এখন উচিৎ সমস্ত রাসূল এবং ঐ সকল ঐশী বাণী বা গ্রন্থ, যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলে, সেটাকে সত্য মনে করা। তবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত শেষ কিতাব ও তার আনীত বিধি-বিধানের উপর আমল করা প্রতিটি মানুষের উপর জরুরি।

সত্য ধর্ম শুধু একটি

তাই একথা বলা কোনো ভাবেই সঠিক হবে না যে, সকল ধর্ম আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু গন্তব্য একটি। সত্য শুধু একটি হয়। আর মিথ্যা হয় অনেক। আলো একটি হয়, আর অন্ধকার হয় অনেক। সত্য ধর্ম একটি, আর শুরু থেকে একটিই ছিল। তাই সেই একটাকেই মানতে হবে, এবং সেই একজনকেই মানা হল ইসলাম। ধর্ম কখনো পরিবর্তন হয় না। সময়ের পরিবর্তনে শুধু আইন-কানুন পরিবর্তন হয়। তাও আবার সেই এক মালিকের বর্ণিত পদ্ধতিতে। মানুষের বংশ একটি, আর তার মালিক একজন। তাই রাস্তাও শুধু একটি। কুরআন বলে-

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"[৮]

---

[৮] সূরা আল ইমরান: ১৯

আরো একটি প্রশ্ন

এই প্রশ্নও মনে আসতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী, এবং তাঁর দূত। তিনি হলেন শেষ নবী। এর প্রমাণ কি?

উত্তর পরিষ্কার। (প্রথমতঃ) এই কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। কুরআন নিজের সত্যতার ব্যাপারে যে প্রমাণ পেশ করেছে, তা সকলকেই মানতে হবে। আর আজ পর্যন্ত কেউ তা খণ্ডন করতে পারেনি। এই কুরআন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য এবং শেষ নবী হওয়ার ঘোষণা করেছে। (দ্বিতীয়তঃ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দুনিয়ার সামনে স্পষ্ট। তার পুরো জীবন ইতিহাসের খোলা গ্রন্থ। দুনিয়াতে কোন মানুষের জীবন, নবীজীর জীবনের মতো সংরক্ষিত ও ঐতিহাসিক নয়। ঐতিহাসিকগণের কেউ এমনকি নবীজীর দুশমন এবং ইসলামের শত্রুরাও কখনো একথা বলেনি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কখনো কারো সাথে মিথ্যা বলেছেন। নবীজীর শহরের লোকজন নবীজীর সত্যতার কসম খেত।

যে মানুষটি নিজের জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি ধর্মের নামে এবং প্রভুর নামে কিভাবে মিথ্যা বলতে পারেন? তিনি নিজেই বলেছেন আমি হলাম শেষ নবী। আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সকল ধর্মীয় গ্রন্থে শেষ অবতার, কল্কি অবতার, শেষ নবীর ব্যাপারে যে সাক্ষী দেয়া হয়েছে, এবং যেসব চিহ্ন বলা হয়েছে, ওই সবকিছু শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিলে যায়।

পণ্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

পণ্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর আনীত ধর্মকে মানবে না, সে হিন্দুও থাকবে না। কারণ হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা আছে, যখন কল্কি অবতার বা নরাশংস এই ভুমিতে আসবে, তখন তাকে মানতে হবে। যে হিন্দু নিজের ধর্মীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না

মেনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে নরকের আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে সে আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

ঈমানের প্রয়োজন

মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়াও এই দুনিয়াতে আমাদের ঈমান বা ইসলামের প্রয়োজন আছে। আর মানুষের কর্তব্য হলো, এক মালিকের পূজা করা। যে ব্যক্তি এক মালিকের দরবার ছেড়ে অন্যের দরবারে মাথা নত করে, সে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট। কুকুরও তার মনীবের দরবারে পরে থাকে। তার সাথেই সম্পর্ক মজবুত করে থাকে। সে কেমন মানুষ! যে নিজ মালিককে ভুলে গিয়ে অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে?

বরং এই ঈমানের বেশী প্রয়োজন মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য। যেখান থেকে মানুষ আর ফিরে আসতে পারবে না। পরকালের জন্য আফসোস কোনো কাজে আসবে না। এই জীবনের মৃত্যুর পর আর মৃত্যু হবে না। মানুষ যদি এই দুনিয়া থেকে ঈমান না নিয়ে চলে যায়, তাহলে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এই দুনিয়ার এক টুকরা আগুন যদি আমাদের শরীরে স্পর্শ করে, তাহলে আমরা অস্থির হয়ে যাই। তাহলে নরকের আগুন কীভাবে সহ্য করবো? যা এই আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি শক্তিশালী হবে। সেখানে চিরকাল জ্বলতে হবে। একবার চামড়া জ্বলে গেলে নতুন চামড়া দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে। ধারাবাহিকভাবে এই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা

হে আমার প্রিয় পাঠক! জানি না কখন কার মৃত্যু চলে আসে। যেই শ্বাস ভেতরে গেছে তা আর বের হয়ে আসার ভরসা নেই। যে শ্বাস বাহিরে আছে তা আর ভেতরে আসার নিশ্চয়তা নেই। মৃত্যুর পূর্বে সুযোগ আছে। এই সুযোগে সবচাইতে বড় দায়িত্বের অনুভব করুন। ঈমান ছাড়া এই জীবনেও কোন সফলতা আসবে না, মরার পরের জীবনেও কোনো উপকার আসবে না।

সকলকে তার মালিকের কাছে যেতে হবে। সেখানে সর্বপ্রথম তাঁর বিশ্বাস তথা 'ঈমান'-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। এখানে আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হল, কাল হিসাবের দিন আপনি যেন না বলে দেন যে, আপনার কাছে প্রভুর কথা পৌঁছায়নি।

আমি আশাবাদী, এই সত্য কথাগুলো আপনার অন্তরে গেঁথে নিয়েছেন। তাহলে আসুন সম্মানিত ভাই, সত্যের আত্মাওয়ালা আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এই মালিককে সাক্ষী রেখে সত্য দিলে, যিনি অন্তর্যামী সেই আল্লাহকে স্বীকার করি, মেনে নেই এবং । অঙ্গীকার করে বলি–

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ পূজার উপযুক্ত নেই। তিনি এক; তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

আমি তওবা করতেছি কুফুর থেকে, শিরক থেকে এবং সকল প্রকার গুনাহ থেকে। আর এই কথার অঙ্গীকার করছি, আমার স্রষ্টা সত্য মালিকের সকল নির্দেশগুলো মেনে চলব এবং তাঁর সত্য নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবো।

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আপনি যদি মৃত্যু পর্যন্ত এ বিশ্বাস এবং ঈমান অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপনার এই ভাই আপনাকে কী পরিমাণ অঢেল ভালোবাসার হক আদায় করেছেন !

ঈমানের পরীক্ষা

ইসলাম এবং ঈমানের কারণে আপনি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারেন। কিন্তু সফলতা ও বিজয় শুধু সত্যেরই হয়ে থাকে। এখানেও সত্যের বিজয় হবেই। আর যদি সম্পূর্ণজীবন পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়, তাহলে এটা মনে করতে হবে যে, এই দুনিয়ার জীবন তো অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুর পরের জীবন হলো চিরস্থায়ী। সেখানে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে চিরসুখের স্থান জান্নাত। নিজ মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং সরাসরি তাঁর সাক্ষাতের জন্য এই পরীক্ষা খুবই নগণ্য।

আপনার দায়িত্ব

আরো একটি কথা হল, ঈমান এবং ইসলামের এ সত্যতা জানা প্রত্যেক ওই ভাইয়ের অধিকার ও আমানত, যাদের পর্যন্ত এখনো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। এইজন্য আপনার দায়িত্ব হলো নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, আপনার ভাইকে ভালোবাসার মাধ্যমে ওই মালিকের রাগ ও দোজখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য,

অন্তরের ব্যথা ও দুঃখের অনুভূতি নিয়ে, দাওয়াত পৌঁছাবেন। যেমন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাটা জীবন সত্য প্রচার করেছেন। ওই ভাই যেন এটাকে সত্য পথ মনে করতে পারে এজন্য আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করুন।

এমন ব্যক্তিকে কি মানুষ বলা যায়? যার সামনে একজন অন্ধব্যক্তি, যে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত, সে আগুনের দিকে যাচ্ছে। আর ঐ লোকটি একবারও মুখ খুলে তাকে এ কথা বলেনি যে, তুমি যে পথে চলছো তা আগুনের পথে যাবে। মানবতার দাবি হলো সে ওই অন্ধ ব্যক্তিকে আগুনের পথ থেকে বাঁচাবে, ওই পথে যেতে বাধা দিবে। তাকে ধরে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। তাকে বলবে, আমি কখনো তোমাকে সে আগুনে পুড়তে দেব না।

ঈমান আনার পর প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব- যারা কিনা দ্বীন, ধর্ম, নবী কুরআন এবং হেদায়েতের পথ পেয়েছে। তারা অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে যারা কিনা শির্ক ও কুফরের জালে আবদ্ধ তাদেরকে বাঁচানোর জন্য মগ্ন হয়ে যাবে। যাতে মানুষ ঈমান থেকে সরে ভুল পথে না যায়।

নিঃস্বার্থভাবে সত্য ও ভালবাসার সাথে যে কথা বলা হয়, তা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে। আপনার মাধ্যমে যদি একজন ব্যক্তি ঈমান পেয়ে যায়, বা একজন ব্যক্তি তার মালিকের সত্য পথে লেগে যায়, তাহলে আপনি সফলকাম হয়ে গেলেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তির উপর খুবই খুশি হন যিনি কুফুর শির্ক থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে সত্য পথে লাগিয়ে দেয়।

আপনার সন্তান যদি আপনার বিরোধী হয়ে আপনার দুশমনদের সাথে মিলে, তাদের কথা মতো চলে, এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আপনার অনুগত বানিয়ে দেয়, তাহলে আপনি তার ওপর কেমন খুশি হবেন? এর থেকেও মালিক ঐ বান্দার প্রতি আরো বেশি খুশি হন, যিনি অন্যকে ঈমান এবং সত্যের পথে ডাকে, সত্যের পথে আসার মাধ্যম হয়।

ঈমান গ্রহণের পর

ইসলাম গ্রহণের পর আপনি যখন মালিকের একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যাবেন, তখন আপনার উপরে দৈনিক পাঁচবার নামাজ ফরজ হবে, যা আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। আপনাকে উত্তমরূপে নামাজ আদায় করা শিখতে হবে। এই নামাজ

অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। আপনি যদি সম্পদশালী হয়ে থাকেন, তাহলে ইসলামের নির্ধারিত অংশ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। প্রাপ্যদের মাঝে যথাযথভাবে বন্টন করতে হবে। রমজানের পুরো মাস রোজা রাখতে হবে। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে জীবনে একবার হলেও মক্কায় গিয়ে হজ্বব্রত পালন করতে হবে।

সাবধান! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে কখনোই মাথা অবনত (প্রণাম) করবেন না।

ইসলামের বিধানে যেসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন- মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা, অপবাদ দেয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া, মদপান, জুয়া, সুদ, শুকরের গোশত, ঘুষ ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সকল খাদ্য খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে খাওয়া উচিত। কুরআনে কারীম সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে; এটি তার প্রেরিত বাণী মনে করে পড়তে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ধর্মীয় শিষ্টাচার শিখতে হবে। মন থেকে এই দু'আ করতে হবে যে, হে আমাদের মালিক! আমাদেরকে আমাদের বন্ধুদেরকে, বংশের লোকদেরকে, আত্মীয়-স্বজনদেরকে এবং দুনিয়াতে যারা বসবাস করে সকল মানুষকে ঈমানের সাথে জীবিত রাখুন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। কারণ ঈমানই হলো মানুষের সমাজের প্রথম ও শেষ ঠিকানা ও শেষ ভরসা। যেমন ঈমান গ্রহণ ও ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র এক নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। অথচ (আগুনের ওপর আল্লাহ্‌র নিষেধ থাকার কারণে) তার একটি চুলও আগুনে পুড়েনি। আজও ঈমানের শক্তি আগুনকে ফুলের বাগান বানাতে পারে। সত্য পথের প্রত্যেক বাধা দূর করতে পারে।

আজও যদি সৃষ্টি হয় ইব্রাহিমের মত মজবুত ঈমান,
বিশাল আগুন তার স্বভাব হারিয়ে হয়ে যাবে ফুলের বাগান।

ইতি

মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

সমাপ্ত